একাত্তরে রেসকোর্সের ভাষণঃ
স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিলের শব্দ ও ভাষাগত বিশিষ্টতা

সাইফুল আলম চৌধুরী

এক.

সন তারিখ ঃ সাতই মার্চ উনিশ শ' একাত্তর, বাইশে ফাল্গুন, তেরশ' সাতাত্তর বঙ্গাব্দ।
সময় ঃ দুপুর তিনটে কুড়ি মিনিট।
স্থান ঃ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান।
আবহাওয়া ঃ শেষ ফাল্গুনের সামান্য গরম। সকালে উজ্জ্বল রোদ, দুপুরের আগে আকাশে সাদা মেঘরাজির আনাগোনা, এক পশলা বৃষ্টি ছিলো সেই মেঘমালায়।
একমাত্র বক্তা ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

রোদ ও মেঘের ছায়ায় প্রকৃতি উন্মত্ত ছিলো উপস্থিত জনসমুদ্রের বিশালতায়। ঢাকা তথা সমগ্র বাঙলাদেশের বাতাস সেদিন 'জয় বাংলা' হিরন্ময় উচ্চারণে অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছিলো। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ে তখন শুধু একটি জিজ্ঞাসা কখন নেতা এসে সেই পরিচিত বজ্রকণ্ঠে এবং তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশে পরম আকাঙ্খিত স্বাধীনতার অমোঘবাণী শোনাবেন, যা' তিনি তাঁর বুকের গভীরতম প্রদেশে লালন করে আছেন।

অপেক্ষা আর ধৈর্যের বাঁধ মানে না। আর নয় পরাধীনতার, শোষণের গ্লানি। এবার শুধু একটি মাত্র আরাধ্য-চাওয়া হয় স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকা, না-হয় যুদ্ধ করে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়া। শুধু তাঁর শেষ নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা। অপেক্ষমান বাঙালি, যাদের তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করেছেন এক আশ্চর্য অসহযোগ আন্দোলনে অথচ নিয়মতান্ত্রিকতার মাঝ দিয়ে।

অবশেষে কবি এলেন। তখন সময়ের ঘড়িতে দুপুর দাঁড়াবার সংগে সংগে সেদিন সমবেত দশ লক্ষাধিক বাঙালি শ্লোগানে শ্লোগানে, বাঙলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে আর 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সঙ্গীতকে কণ্ঠে ধারণ করে অভিনন্দন জানালেন নেতাকে- 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা-যমুনা।' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাঙলাদেশ স্বাধীন করো'। 'আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব।

তিনি সরাসরি মঞ্চে উঠে তাঁর সেই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাষণ দেন ঃ

'ভায়েরা আমার,
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।
কি অন্যায় করেছিলাম?
নির্বাচনের পরে বাঙলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে-আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সংগে বলতে হয়, তেইশ বচ্ছরের করুণ ইতিহাস-বাংলার অত্যাচারের, রঞ্জিত করার ইতিহাস।
উনিশ শ' বায়ান্ন সালে রক্ত দিয়েছি। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। উনিশ শ আটান্ন সালে আয়ুব খাঁন মার্শাল ল' জারি করে দশ বচ্ছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। উনিশ শ' সষট্টি সালে ছয় দফার আন্দোলনে সাতই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। উনিশ শ উনসত্তরের আন্দোলনে আয়ুব খাঁনের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন- তিনি বললেন, দেশের শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেন নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল।

নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান সাবের সাথে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়-পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম- পোনেরেই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদে অধিবেশন দেন।
তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা এসেম্বলীতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো। এমন কি, আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ নায্য কথা বলে- আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও- একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।
জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন। আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, যে আলোচনার দরজা বোন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, দলের সঙ্গে আলাপ করলাম। আপনারা আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি থেকে পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলী চলবে।
তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেয়া হলো। এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাব এসেম্বলী ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।
তারপরে হঠাৎ বোন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।
বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।
আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তি পূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।
কি পেলাম আমরা?
যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য। আমরা পকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
টেলিফোনে আমার সংগে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।
উনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি দশ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমিতো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর.টি.সি? কার সংগে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সংগে বসবো? হঠাৎ করে আমার সংগে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার,
পঁচিশ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে।
রক্তের দাগ শুখায় নাই।
আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, অই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আর.টি.সি তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।
এসেম্বলী কল করেছেন। আমার দাবি মানতে হবে প্রথম।
সামরিক আইন-মার্শাল ল' উইড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে।
আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপরে বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না।
আমি আমি, প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে- সেই জন্য সমস্ত অন্য অন্য জিনিষগুলো আছে- সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে। রেল চলবে। লঞ্চ চলবে।
শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোট, জজ কোর্ট, সেমি-গভার্মেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা- কোনো কিছু চলবে না।

আটাশ তারিখে কর্মচারীরা যায়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়- আর যদি একটা গুলি চলে- আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর/কাছে আমার অনুরোধ আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বোন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।
তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো। কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।
আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভায়েরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছায়ে দেবেন।
সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা' বলি তা' মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বোন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না।
শোনেন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্ম-কলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।
এই বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।
মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও ষ্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।
দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাঙলার থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।
টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এ পূর্ব বাঙলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়- বাঙালিরা বুঝে-শুনে কাজ করবেন।
প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা' কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি- রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম- আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম।
জয় বাংলা।
ছয় তারিখ রাত পর্যন্ত- সেই পাঁচ দিন সময় পেয়েছিলেন। রেসকোর্সে মুজিব স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে মনে হয়, সম্পূর্ণ ভাষণটা তিনি নিখুঁতভাবে স্মৃতিতে ধারণ করে নিয়েছিলেন।
তিন. একাত্তরের সাতই মার্চ রেসকোর্সের ভাষণ, যা বাঙলাদেশের স্বাধীনতার এক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দলিল। এই ভাষণে আমরা শব্দের কারুকাজ, ধ্বনির ব্যবহার, অর্থের বহুমাত্রিকতা এবং ভাষাগত বিশিষ্টতা প্রত্যক্ষ করি।
১. ভাষণে নিজের, জনতার ও বিবেকের কাছে প্রশ্নাবলী ঃ
(ক) কি অন্যায় করেছিলাম? (খ) কি পেলাম আমরা? (গ) কিসের আর.টি.সি? (ঘ) কার সংগে বসবো? (ঙ) যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সংগে বসবো?
২. ভাষণে উচ্চারিত ব্যক্তিবর্গের নাম ঃ (ক) এহিয়া খান, (খ) আয়ুব খান, (গ) ভুট্টো (ঘ) মুজিবুর রহমান
৩. বাঙলাদেশের ভাষা ও স্বাধীকার আন্দোলনের বিভিন্ন বছরগুলো বিধৃত হয়েছে ভাষণে ঃ (ক)১৯৫২- ভাষা আন্দোলবন (খ) ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই ক্ষমতাচ্যুতি (গ) ১৯৫৮- সামরিক শাসন (ঘ) ১৯৬৬ ছয়দফা প্রস্তাব (ঙ) ১৯৬৯- গণ অভ্যুত্থান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার (চ) ১৯৭০ - নির্বাচন ও নতুন ষড়যন্ত্র।
৪. ভাষণে পূর্বঞ্চাল ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ ঃ (ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) খুলনা (ঘ) রাজশাহী (ঙ) রংপুর (চ) পেশোয়ার (ছ) করাচি।
এছাড়া তিনি ভাষণে বিভিন্ন প্রসঙ্গে
৫. ভাষণের উচ্চারিত বাক্যে শব্দের অনুপ্রাস লক্ষ্যণীয়ঃ
(ক) আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত। (খ) এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার। (গ) আমার বাঙলার মানুষের বুকের উপর। (ঘ) আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। উল্লিখিত বাক্যসমূহে আমরা 'র' এবং 'ন'' অনুপ্রাস প্রত্যক্ষ করেছি।

৬. লোক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান 'প্রবাদ', যা প্রাজ্ঞ উক্তি লোক পরম্পরায় জনশ্রুতিতে চলে আসছে এবং যা আক্ষরিক ও ব্যঞ্জনার্থে ব্যবহৃত হয়ে শব্দচিত্র নির্মাণ করে, ভাষণে তাও আমরা লক্ষ্য করিঃ

(ক) 'ভাতে মারবো, পানিতে মারবো'।

অর্থাৎ হাতে নয়, আঘাত দিয়ে নয়, উপবাসে রেখে কিংবা অন্য কৌশলে শত্রুকে কাবু কিংবা বশ করা হবে, যা' অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার ছিলো। কর্তৃত্বের ধারণা থেকে এই প্রবাদের অবয়ব নির্মিত হয়েছে।

৭. ভাষণের বিভিন্ন অংশে বাক্যে কাব্যময়তা ভাষণটিকে বিশিষ্টতা দান করেছেঃ

(ক) জীবনের তরে (খ) বাঙলার মানুষ মুক্তি চায়/বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়/বাঙলার মানুষ তার অধিকার চায়। (গ) তেইশ বছরের ইতিহাস/বাঙলার অত্যাচারের, বাঙলার মানুষের রক্তের ইতিহাস/তেইশ বচ্ছরের ইতিহাস/মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস/বাঙলার ইতিহাস/এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। (ঘ) এবারের সংগ্রাম/আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম/স্বাধীনতার সংগ্রাম। (ঙ) আমরা ভাতে মারবো/আমরা পানিতে মারবো।

৮. সমতট, দক্ষিণ বাঙলার ভাটি অঞ্চলের জনপদের উচ্চারিত লোকজ শব্দাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষণে এসেছে ঃ

ভায়েরা, সবই, বচ্ছর (বছর), সাতঅই (সাতই), বোন্ধ (বন্ধ), শুখায় (শুকানো), যদ্দুর, দমাতে, দাবায়, দেবার, মায়না-পত্র, পয়সা, পারবা (পারবে), পাড়া পৌছায়ে, রাখবা (রাখবে), যায়ে (গিয়ে), পোনারো (পনের), কোল ইত্যাদি।

৯. শব্দের ও বাক্যাংশের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটেছে ভাষণের কতিপয় অংশে, যা সেই সময়ে সেই বৈরী পরিবেশে প্রতীকী উচ্চারণেই প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত ছিলো ঃ

(ক) আমি যা' বলি তা' মানতে হবে (নির্দেশ অর্থে)। (খ) তোমার যা' কিছু আছে, তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে (শক্তি-সামর্থ, আগ্নেয়াস্ত্র ও মনোবল

১০. জোড়া সমার্থক শব্দের (সমার্থক দ্বন্দ্ব, প্রতিশব্দ) বহুল ব্যবহার ভাষণে লক্ষ্যণীয় ঃ

টাকা-পয়সা, কোর্ট-কাচারী, কল-কারখানা, রাস্তা-ঘাট, মায়না-পত্র, হিন্দু-মুসলমান, সামরিক আইন-মার্শাল ল', রেডিও-টেলিভিশন, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ, খাজনা-ট্যাক্স, আদালত-ফৌজদারী, বাঙালি-নন বাঙালি, হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্ট ইত্যাদি।

১১. ভাষণে সর্বাধিক উচ্চারিত বাক্যাংশ, যা' তাঁর স্বভাবগত এবং হৃদয় থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসায় উৎসারিতঃ

ক. আমারঃ আমার গরীব, আমার বাঙলার, আমার মায়ের, ভায়েরা আমার, আমার মানুষের, আমার লোকের, আমার বুকের, আমার দাবী, আমার দেশের, আমার অনুরোধ, আমার মানুষ, আমার রিলিফ কমিটি, আমার সংগে। খ. বাঙলারঃ পূর্ব বাঙলার, বাঙলার ইতিহাস, বাঙলার মানুষ, বাঙলার অত্যাচারের, বাঙলার মানুষকে।

১২. ভাষণে তিনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হতে ভালোবেসে বাঙালীকে 'তুমি' সম্বোধনে নির্দেশে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন, যা' পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অনন্য ব্যতিক্রম ঘটনাঃ

ক. তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো। খ. তোমাদের যা' কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। গ. মনে রাখবা। ঘ. ..... সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো। ঙ. প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। চ. আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বোন্ধ করে দেবে।

১৩. তিনি ভাষণে কিছু কিছু শব্দের উপস্থাপনায় 'জোর' বা 'ট্রেস' দেনঃ

আজ, আমি, মানুষ, সম্পূর্ণভাবে. . . .

১৪. মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসায় ভাষণে উচ্চারিত হয়েছে লৌকিক ক্রিয়াপদঃ

ক. সাতকোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।খ. পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই। গ. যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়। ঘ. অই শহীদদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আর.টি.স্থিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। ঙ. মরতে যখন শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

এখানে দাবায়ে রাখতে, বলে দেবার, আমার লোককে, রক্তে পাড়া শব্দসম্পদ সৌরভ ও মহিমা নিয়ে এই ভাষণ বাংলার প্রকৃত ও লোকায়ত ভাষণ হয়ে গেল।

১৫. ভাষণে তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং আরবী, ফার্সী, ইংরেজীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন বিদেশী শব্দের আশ্চর্য সুন্দর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি, যা' ভাষণকে অনন্যতায় সমৃদ্ধ করেছে ঃ

আজ, গদি, গোলাম, হরতাল, গুলি, দোষ, হাজির, দুর্গ, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোট, জজকোর্ট, ব্যাংক, রেল, লঞ্চ, স্টেশন, রেডিও, টেলিভিশন, সেক্রেটারিয়েট, কনফারেন্স, এসেম্বলী, মার্চ, ফেব্রুয়ারি, প্রেসিডেন্ট, উইথড্র, রাউন্ড টেবিল, ট্যাক্স, ব্যারাক, মেজরিটি, ওয়াপদা, রিলিফ, কমিটি, সেমি-গভার্মেন্ট, টাকা, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, নিউজ, আওয়ামী, লীগ, কোর্ট, জোর, কল-কারখানা ইত্যাদি।

১৬. ভাষণে ত্রয়ীশব্দের সংমিশ্রণে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার আমরা প্রত্যক্ষ করি ঃ

ক. দুঃখ-ভারাক্রান্ত-মন খ. রাউন্ড টেবিল-কনফারেন্স গ. সুপ্রীমকোর্ট-হাইকোর্ট-জজকোর্ট ঘ. বুঝে-শুনে-কাজ ঙ. অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চ. আসুন-দেখুন-বিচার করুন।

১৭. ভাষণে বাচ্যের ব্যবহার ঃ

আমি বললাম, তিনি বললেন, উনি বললেন প্রভৃতি বাচ্যের ব্যবহার ভাষণটিকে প্রাণবন্ত করেছে।

চার

১. ভাষণের পর্ব ভাগ ঃ

ক. সংগ্রাম, আন্দোলন ও অত্যাচারের ইতিহাস। প্রথম পর্বে ভাষা আন্দোলন, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ ও ষড়যন্ত্র, আয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন, ঐতিহাসিক ছয়দফা প্রণয়ন ও গণ আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও গণ অভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচন প্রসঙ্গ এসেছে।

ক. চলমান সম-সাময়িক ঘটনাবলী। দ্বিতীয় পর্বে ভাষণে বিধৃত হয়েছে সত্তরের নির্বাচনে বাঙালিদের নিরঙ্কুশ জয়লাভের পর পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ও অন্যান্য নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্র, অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, বিভিন্ন শর্ত আরোপ।

গ. সার্বিক পরিস্থিরি ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পর্বে সমগ্র বাংলাদেশের ওপর শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। এই পর্বে কতিপয় আবেদন, হুঁশিয়ারি উচ্চারণ ও নির্দেশাবলী উচ্চারিত হয়েছে।

ঘ. স্বাধীনতার ঘোষণা। শেষ পর্বে জনগণকে স্বাধীনতার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রস্তুত করা হয়েছে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

২. ভাষণের বিধৃত শর্তাবলী ঃ

ক. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে খ. সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে গ. সকল হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত হতে হবে। ঘ. জনগণের প্রতিনিধির কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে।

-সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্মেন্ট দপ্তরসমূহ, ওয়াপদা বন্ধ থাকবে।

- রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, রেল ও লঞ্চ চলবে।

- মাসের আটাশ তারিখ কর্মচারীরা বেতন নেবেন।

- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।

- যারা শহীদ বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের সাহায্যার্থে রিলিফ কমিটিতে অর্থ সাহায্য দানের আবেদন।

- হরতালের ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের বেতনদানের জন্য শিল্প মালিকদের নির্দেশ।

- সরকারী কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ-যা' বলি তা' মানতেহবে।

- দেশের সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স প্রদান না করা।

- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কর্মকান্ডে সতর্ক থাকা।

- রেডিও-টেলিভিশনে অসহযোগ ও বাঙালীদের সংবাদ প্রচারের নির্দেশ।

- ব্যাংক কর্মচারীদের প্রতি আদেশ।

- টেলিফোন বিভাগের প্রতি নির্দেশ।

- সর্বোপরি স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার নির্দেশ।

একাত্তরের সাতই মার্চ ছিলো রোববার। বাঙালী জাতি সহস্র বছর অপেক্ষা করেছিলো স্বাধীনতার অমোঘবাণী শোনার জন্যে, যা বিশ্বের ইতিহাসে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, শব্দ বা ভাষাগত বিশিষ্টতায় অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

ক. প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধুঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ/মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

ক. গেটিসবার্গ ও রেসকোর্স ঃ দুই ভাষণের সমান্তরালতা/আলাউদ্দিন আল-আজাদ।